

# ভাগবতী তনু

॥ প্রথম খণ্ড ॥

অচিন্ত্যকুমার (সনগুপ্ত)

শিৱ ও মোষ

• ভ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৭৭

প্রচ্ছদপট-অঙ্কন

শ্রীঅজিত গুপ্ত



মিত্র ও বোম, ১০ ভায়াচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কতৃক প্রকাশিত ও  
পি. এম. বাক্টি অ্যান্ড কোম্পানী আইভেট লিমিটেড, ১৯ গুলু ওতাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে  
শ্রীঅরুণ বাক্টি কতৃক মুদ্রিত

শ্রীপ্রমথনাথ বিনী  
প্রিয়বরেষু

এই লেখকের অগ্ৰাণ্ণ জীবনী গ্রন্থ :

অথগু অমিয় শ্রীগোৱাজ ( তিন খণ্ডে সম্পূৰ্ণ )

পৰমপুৰুষ শ্রীশ্রীৰামকৃষ্ণ ( চাৰ খণ্ডে সম্পূৰ্ণ )

পৰমা প্ৰকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

বীৰেশ্বৰ বিবেকানন্দ ( ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড )

জগদগুৰু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

ভক্ত বিবেকানন্দ

ৰত্নাকৰ গিৰিশচন্দ্ৰ

গৰীয়সী গোৱী

কবি শ্রীৰামকৃষ্ণ

উদ্ধত খড়গ ( সূভাষচন্দ্ৰৰ জীবনী ১ম, ২য় খণ্ড )

গোৱাজপৰিজন

ভাগবতী তনু



## ॥ এক ॥

‘হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরম পুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তন্ন করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ-অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক। তোমার সেই প্রসন্নতা আমার বুদ্ধিকে প্রশান্ত করুক, হৃদয়কে পবিত্র করুক, শক্তিকে মজ্জল করুক। তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদসঙ্কট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবনপথের সঞ্চল হয়ে থাক।’

এই প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথের।

খডদা আর সোদপুরের মাঝখানে পেনেটি। সেখানে ছাত্তুৰাবুর বাগান-বাড়িতে এসেছে রবীন্দ্রনাথ। বালক রবীন্দ্রনাথ।

এসেছে ডেঙ্গুজরের ভয়ে। ডেঙ্গুজরের গড়ক লেগেছে কলকাতায়।

এই প্রথম বাইরে আসা। ইট-কাঠ-পাথরের খাঁচার বাইরে মুক্তাঙ্গন বিশ্বকে সম্ভাষণ করা।

গঙ্গাতীরেই বাগানবাড়ি। বারান্দার সামনে পেয়ারা বন। পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে বারান্দায় বসে থাকে রবীন্দ্রনাথ। নৌকো দেখে। দাঁড় টেনে পাল তুলে ভেসে চলেছে নৌকো, কোন নাম না-জানা বিশ্বয়ের বন্দরে। মানচিত্রের সীমানা না যেনে, ভূগোলের গতি পেরিয়ে চিরন্তন রহস্যরাজ্যে।

এই রহস্যটিই আদিম ও অন্তহীন। আর আমার দুই চোখে বালকের সত্যোজাগ্রত বিশ্ব।

দেখি আর অবাক হই। অবাক হয়ে দেখি কিন্তু প্রকাশের ভাষা নেই। ‘কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে।’ ভাবার শেষ আছে অভিধানে কিন্তু অল্পভবের অভিধান কোথায় ?

মনে মনে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়ে। যে বাড়ি থাকলে রাজার বাড়ি হত না সেই রাজার বাড়ির খোঁজে। নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছে যেসব নৌকো,

তারই একটার সোয়ারি হয়ে। কল্পনার অমরাবতীকে সে ছুঁয়ে আসবে।  
সৌধ-চূড়ের একটি সোনার প্রদীপ ডাকে বুঝি তাকে হাতছানি দিয়ে।

‘কোথায় আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।’

সে তো মনে, কিন্তু বাস্তবে ?

কী আছে বাস্তবে, দেখাই যাক না। অচেনাকে আমার ভয় কী ! আমার  
মাও তো অচেনা ছিল কিন্তু নিল তো কোল পেতে !’

‘ছিল আমার মা অচেনা, নিল আমার কোলে।

সকল প্রেমই অচেনা গো, তাই তো হৃদয় দোলে।’

কিসের টানে কে বলবে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বেরিয়ে পড়েই  
দেখল পায়ে শেকল আঁটা।

আগে আগে যাচ্ছেন দুজন অভিভাবক। পিছনে কে আসছে তারা টের  
পেরেছেন।

‘এ কী তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

জ্ঞানমুখে থমকে দাঁড়াল রবীন্দ্রনাথ। ধরা পড়ার মানে কী, যেন বুঝতে  
পেরেছে নিমিষে।

‘ছি ছি, এ তোমার কী পোশাক ! যাও যাও এখুনি ফিরে যাও।

পোশাকে কোথায় ক্রটি বুঝতে দেরি হল না। রবীন্দ্রনাথের গায়ে জামা’  
থাকলেও চাদর নেই, আর পা জুতোপরা থাকলেও মোজা-ছাড়া।

ফিরে এল বাড়িতে। বসল এসে বারান্দায়। অগ্নান চোখে দেখতে  
লাগল গন্ধাকে।

কৃতি সংশোধন করবার উপায় নেই। যার যোজাও নেই চাদরও নেই তার  
কলঙ্কমোচন হয় কী করে ?

কিন্তু গন্ধাই সমস্ত নিকলঙ্ক নির্বন্ধন করে দিল। মনকে ছুটি দিল জলশ্রোতে।  
শ্রোতে ভাসতে মনের সাজসজ্জা লাগে না। কারু সাধ্য নেই মনের পায়ে  
শিকলি এঁটে খাচার পুরে বন্দী করে। দূর দেশে ভেসে যাই, পরীর বাড়ির  
বন্ধ দরজায় গিয়ে থাকি মারি।

যেখানে বেগ সেখানেই মুক্তি। যেখানে শ্রোত সেখানেই স্বচ্ছতা। একটি  
মুক্তিবিপ্লবীণী আনন্দময়ী নদী সেই কবে থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে  
ঠাই নিয়েছে।

শুধু কর্ম আর কলঙ্কনি—নদী এক নিকরদেশ নিরাকুলতার নাম।